Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 193 – 203
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

রাঢ় অঞ্চলের দুই কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাসান আজিজুল হক : একটি তুলনামূলক সমীক্ষা

সুচন্দ্রা রায়
প্রাক্তন গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : suchandra.roy.1991@gmail.com

Keyword
Tarasankar Bandyopadhyay, Hasan Azizul Huq, Rarh Bengal, Narrative, Raikamal, Agunpakhi, Jiban Ghoshe Agun, 20th Century literature, Diaspora, Partition Literature.

Abstract
Tarasankar Bandyopadhyay and Hasan Azizul Huq are famous Bengali prose writers who hailed from the Rarh area of western Bengal. Hasan Azizul Huq was a well-known writer of Bangladesh, but he wrote the narrative of Rarh Bengal on his childhood memories and experience. He had to shift to East Pakistan with his family after the partition of Bengal in 1947 as his family was from Muslim Community. But he couldn't leave his birthplace satisfactorily and he went to East Pakistan as a refugee. So, his narrative of Rarh Bengal is strongly attached to the discourse of partition, communal violence, simultaneous Indian political History, and mainly the human struggle for existence. On the other hand, in the world of Tarasankar's Rarh Bengal, faith in the old can be found intensely. tradition is worshipped through literature by Tarasankar so dedicatedly that he believed the Rarh Bengal would remain eternal with its indigenous folk culture, faith, socio-economic structure, and zamindari system. In this paper, a comparative analysis is discussed between these writers to evaluate the literary perspectives of Rarh Bengal's narration by emphasizing the own narrative technics applied by both authors.

Discussion
বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার আছে আছে রাঢ়বাংলার কথাসাহিত্য। চমকপ্রদ সত্য হল এটাই যে, একটি বিস্তীর্ণ কালপর্ব জুড়ে এই রাঢ়বাংলাকে ঘিরে এপার ওপার দুই বাংলা সাহিত্যের জগতেই অসাধারণ সব সাহিত্যিক নিদর্শনের জন্ম হয়েছে। এরকম ঘটনা বিশেষ বিশেষ নগরাঞ্চল বাদে আর কোনো প্রান্তিক অঞ্চলকে ঘিরে হয়েছে কিনা তার উদাহরণ বিরল। তাছাড়াও কৌতূহলের ব্যাপার হল, এপার বাংলায় রাঢ় অঞ্চল বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেও ওপার বাংলাতেও এটি সম্ভব হয়েছে, যখন রাঢ় বাংলার সঙ্গে সেই অর্থে বাংলাদেশের বিশেষ কোনো যোগাযোগ নেই।

তারাশঙ্কর বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে বাংলা সাহিত্যের দরবারে আত্মপ্রকাশ করেন। ‘ত্রিপত্র’ নামক কাব্যগ্রন্থ দিয়ে তিনি লেখালেখির সূচনা করলেও তাঁর প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সার্থক উপন্যাস ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘চৈতালি ঘূর্ণি’ থেকে তিনি রাঢ়বাংলার একজন সার্থক কথাকার হয়ে উঠতে থাকেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের উপন্যাসে স্বভাবতই সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা সর্বভারতীয় কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনকে রাঢ়বঙ্গের সদগোপ চাষী গোষ্ঠ-র জীবন সংগ্রামের প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তারাশঙ্করের সমগ্র সাহিত্যজীবন জুড়ে মূলত রাঢ় অঞ্চলের আখ্যানই পাওয়া যায়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁর জীবনের শেষ রাঢ়কেন্দ্রিক উপন্যাস ‘কীর্তিহাটের কড়চা’ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে, তাঁর মরণোত্তর কালে। অর্থাৎ, প্রায় চার দশক জুড়ে তারাশঙ্কর যে বিপুল পরিমাণ সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তার সিংহভাগই রাঢ় অঞ্চলের কথকতা। সাহিত্যে রাঢ়বঙ্গের প্রতি তাঁর এত তীব্র আত্ম-নিবেদন, জন্মভূমির প্রতি আন্তরিক দায়বদ্ধতা থেকে সহজেই অনুমেয় যে ভাগিরথী-গঙ্গার পশ্চিম পাড় থেকে ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বদিকে অবস্থিত ভৌগোলিক অঞ্চলটিকে তিনি শুধুই একটি অঞ্চল হিসাবে দেখতেন না, এমনকি জন্মভূমি বলে শুধুমাত্র বিশিষ্ট বলেও মনে করতেন না, তাঁর জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর-গবেষক জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত,

> “তারাশঙ্কর সম্বন্ধে প্রথমেই যেটা মনে হয়, তিনি ও বীরভূম দুই সমার্থবাচক শব্দ। বৃহত্তর বীরভূম তথা রাঢ়ের জীবনপট অঙ্কণে তিনি একমাত্র প্রতিনিধিত্বের দাবিদার। আর কোনো শিল্পীকে এ গৌরব প্রদান আজো সম্ভব নয়।”[১]

বীরভূম-বর্ধমান জেলার রাঢ় অঞ্চলের প্রতি তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ ছিলেন, তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর চার দশকব্যাপী বৃহৎ সাহিত্যকীর্তির দিকে তাকালে। তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্পের মাধ্যমে তিনি রাঢ় অঞ্চলকে সাহিত্যগতভাবে ধরে রাখতে চেয়েছেন বারবার। তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন, পরবর্তীকালে রাজনীতির সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রাঢ় অঞ্চলের স্বরূপ উদ্ঘাটনে জীবনের দ্বিতীয় পর্বে তিনি সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন।

ভারতভাগের পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবন, তথা তাঁর সমগ্র জীবনেরই শেষ দশকে তাঁর কলমে যখন উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি প্রভৃতি অজস্র সাহিত্যিক ধারার স্ফূরণ ঘটে চলেছে, সেই সময় ওপার বাংলায় এক তরুণ লেখকের কলমে রাঢ় অঞ্চল আবার ভিন্নভাবে বিশিষ্টরূপে ফুটে উঠতে থাকে। “ভিন্নভাবে”, কারণ সে দেশ অন্য, লেখক নিজেও তখন আর রাঢ়বঙ্গের বাসিন্দা নন, অথচ জন্মভূমি বলে রাঢ়বঙ্গের প্রতি একান্ত অনুরাগী; কিন্তু রাঢ়বঙ্গকে তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারছেন না, রাঢ় রয়েছে তাঁর স্মৃতিতে। তাঁর লেখায় রাঢ়বঙ্গের ব্যুৎপত্তিও এই স্মৃতিই। ইনি হলেন হাসান আজিজুল হক, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ছোটগল্প ‘শকুন’ দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন রাঢ় অঞ্চলের বাসিন্দা, বর্ধমান জেলার যবগ্রামের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে তাঁর জন্ম। কিন্তু দেশভাগের কারণে তাঁকে তাঁর জন্মভূমি ছেড়ে নবগঠিত বাংলাদেশে চলে যেতে হয়, ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে পরবর্তীকালে তিনি সেখানেই অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। তারাশঙ্করের মত দীর্ঘকাল জুড়ে তিনি রাঢ়কে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাননি। তাঁর শুধুমাত্র শৈশব ও কৈশোরকালই কেটেছে রাঢ়বঙ্গের বুকে, কিন্তু বাল্যকালের সেই সময়টুকুতেই রাঢ়বঙ্গ তাঁর অন্তরচেতনায় গভীরভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। তাই পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হয়ে উঠলেও তাঁর রচিত আখ্যানে বাংলাদেশের পাশাপাশি রাঢ় অঞ্চলের প্রেক্ষাপটকেও বিশিষ্টতা অর্জন করতে দেখা যায়। মানুষের জীবনসংগ্রাম, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মন্বন্তর থেকে শুরু করে দুই বিশ্বযুদ্ধকেও তিনি দেখিয়েছেন রাঢ়বঙ্গের প্রেক্ষাপটে। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে একুশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক অবধি প্রায় ছয় দশক ধরে তাঁর রচনায় রাঢ় অঞ্চল নির্মিত হয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকে, চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, ভিন্ন ভিন্ন ধারার কথকতায়। অর্থাৎ, বাংলা সাহিত্যে রাঢ়বঙ্গের আখ্যান পাওয়া যায় টানা বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে শুরু করে একুশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক অবধি নয়টি দশক জুড়ে— বঙ্গভূমির প্রান্তিক অঞ্চল হিসাবে এইরূপ সাহিত্যিক সম্মান প্রাপ্তি আর কোনো অঞ্চলের ক্ষেত্রে একান্তই বিরল।

তারাশঙ্করের রাঢ়বঙ্গের কথকতা যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক সেখান থেকেই শুরু করেছেন হাসান আজিজুল হক, এমন কথা বলা যাবে না। দুই লেখকের গল্পবিশ্ব ছিল ভিন্ন, দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন, দুইজনেই আলাদাভাবে তাঁদের জীবনের রাঢ় অঞ্চলের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যায়িত করে গেছেন। তাও বলা যায়, রাঢ়বঙ্গের গল্প বলতে গিয়ে তাঁরা সাহিত্য রচনার যে বিশেষ ভঙ্গিতে মিল ঘটিয়ে ফেলেছেন, তা খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁদের সমকালীনতার চেতনায়। তাঁদের প্রিয় রাঢ়বঙ্গকে তাঁরা সমকালীন স্থান-কাল ও রাজনৈতিক ঘটনার চেতনার প্রেক্ষাপটে নির্মিত করেছেন। তাই তাঁদের রচনায়, রাঢ়বঙ্গ এই পৃথিবীর কোনো বিচ্ছিন্ন জগৎ নয়, তা হয়ে উঠেছে সমগ্র দেশের, সমগ্র জাতির, এমনকি স্থান-কাল-বিশেষে সমগ্র বিশ্বেরই একটুকরো নিদর্শন। রাঢ়বঙ্গের আধারে তারাশঙ্করের রচনা কখনোই সমকাল-বিচ্ছিন্ন নয়, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'চৈতালি ঘূর্ণি'-এর কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, 'ধাত্রীদেবতা'-তে শিবুর রাজনৈতিক সক্রিয়তায়, 'কালিন্দী'-এর মিল-মালিকদের ভূমি-আগ্রাসনের ইতিহাস বর্ণনা থেকে শুরু করে তাঁর সমস্ত রাঢ়কেন্দ্রিক রাজনৈতিক উপন্যাসে ও গল্পকথায়। অপরদিকে হকের রাঢ়বঙ্গের রচনা যেমন, 'আত্মজা ও একটি করবীগাছ'-এ পাওয়া যাবে দেশভাগের স্মৃতি, 'আগুনপাখি' উপন্যাসে পাওয়া যাবে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উল্লেখ, দাঙ্গা, দেশভাগ ও ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মন্বন্তরের চিত্র। যদিও 'আগুনপাখি' একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রকাশিত, তবুও এই উপন্যাস প্রায় ষাট বছর পূর্বের দেশভাগের ঘটনাকে রাঢ়বঙ্গের প্রেক্ষাপটে যথার্থভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। কারণ এই উপন্যাসটি তার অনেক আগে থেকেই ছোটগল্পের আকারে বহু বছর ধরে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে চলেছিল।

কোনো অঞ্চলকে নিজের দেশ বলে মনে করে রচিত সাহিত্য, ও কোনো অঞ্চল থেকে জীবনধারণের জন্য অন্যত্র চলে যাওয়ার পর সেই অঞ্চলকে ঘিরে রচিত সাহিত্য—দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, কালের পার্থক্য ছাড়াও তারাশঙ্কর ও হাসান আজিজুল হকের রাঢ়কেন্দ্রিক রচনার এটাই ছিল সবচেয়ে বড় পার্থক্য। এজন্য রাঢ় অঞ্চলকে নিয়ে যে নিশ্চয়তা তারাশঙ্করের রচনায় পাওয়া যায়, হাসান আজিজুল হকের রাঢ়কথায় সেখানে যুক্ত হয়ে গেছে বহুমাত্রিকতা। তারাশঙ্করের লেখায় রাঢ় অঞ্চলই যেন একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে রাঢ়বঙ্গের বর্ণনা তিনি দেন উচ্ছ্বসিতভাবে, এবং জায়গাবিশেষে তা কতকটা অনাবশ্যকও হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে 'কবি' উপন্যাসের কাহিনির শেষাংশের উল্লেখ করা যায়। কাশী চলে যাওয়ার পর নিতাইয়ের স্মৃতিতে শুধু দেশের কথাই ঘুরেফিরে আসে। কাহিনির অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বসন্ত ও ঠাকুরঝি তার স্মৃতিতে আসে দেশের অনুষঙ্গ হিসাবেই। সমগ্র উপন্যাসটিকে তিনটি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের বিচিত্র সূক্ষ্ম উত্থান-পতনের জালে বোনা হলেও শেষাংশে খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে নিতাইয়ের ফেলে আসা জন্মভূমির জন্য অত্যন্ত টান। উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের মতে,

> "কাশীতে গিয়ে অনভ্যস্ত পরিবেশে নিজের গ্রাম, নদী, মাঠ, ঠাকুরঝি, বসন ও অন্যান্য সঙ্গস্মৃতি তাকে যে ভাবে বাংলাদেশে নিজের গ্রামে টেনেছে তাতে ঔপন্যাসিকের স্বদেশী ভাবনা যতটা প্রাধান্য পেয়েছে তুলনায় নিতাইয়ের গভীর গোপন অপরিমেয় ভালোবাসার টানটি গৌণ হয়ে গেছে। যেন মাতৃভূমির অনেক অনুষঙ্গের মধ্যে দুটি আবেগঘন পর্ব একাকার হয়ে গেছে। ... তাকে তীর্থে ঘুরিয়ে তার মনের মধ্যে বাংলাদেশ ও তার নিজের গ্রাম যেভাবে এসেছে তাতে বসন্তের 'কেয়াফুল' আছে, ঠাকুরঝির 'কাশফুল'ও আছে কিন্তু তাদের ছাপিয়ে ধুলোমাটির পুণ্য স্পর্শও আছে। ঠাকুরঝি ও বসন্তের সূত্রে নিতাইয়ের যে টেনশন উপন্যাসের কাঠামো তৈরি করেছে তার সঙ্গে এই পুণ্য মাতৃভূমির-চেতনা সমান্তরাল বিন্যাসে গাঁথা নয়।"[২]

উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় অন্য হলেও তারাশঙ্কর তাঁর জন্মভূমির প্রতি আবেগকে বাদ দিতে পারেন না। বরং সেটাকেই মুখ্য করে তোলার চেষ্টা করেন। রাঢ়বঙ্গ নিয়ে তাঁর এই উচ্ছ্বাসের কারণে কাহিনির বুনোটে তাই শৈথিল্য চোখে পড়ে।

রাঢ়বাংলার প্রতি আবেগের শৈথিল্যের কারণে তারাশঙ্কর চেষ্টা করেন রাঢ়বঙ্গের কথকতার কেন্দ্রবিন্দুতে রাঢ়কেই রাখতে। লেখক হিসাবে এটি তাঁর সাহিত্যিক উচ্ছ্বাস প্রকাশের একটি বিশেষ জায়গা ছিল। হাসান আজিজুল হকের ক্ষেত্রে এইখানটাতে তাঁর বিশেষ সংযম দেখা যায়। তিনি মনে করেন লেখক হিসাবে তাঁর অনেক দায়, মানুষের জীবনসংগ্রামের কথাকে তিনি তাই সাহিত্যের মাধ্যমে লিখে রেখে যেতে চান। চন্দন আনোয়ারের ব্যাখ্যায়,

> "যে সময় ও সমাজে তিনি জীবনযাপন করেন, সেই সময়, সমাজ ও সমাজের মানুষকে নিয়ে তাঁর বলার কথাগুলোকেই নিজের মতো সাজিয়ে উপস্থাপন করেন গদ্যে। এছাড়া বেঁচে থাকার রসদ সরবরাহ করে যে-

> সমাজ, সে-সমাজের একজন ভোক্তা হিসেবে লেখকের যে-ঋণ, লেখার মধ্য দিয়ে সে-ঋণ শোধ দেওয়ার একটি দায়বোধ কাজ করে। তাই লেখাকে তাঁর সাধ্যমতো একটি শ্রেষ্ঠ 'কাজ' হিসেবেই মনে করেন। তিনি মনে করেন, 'লেখকের দায় তাই বড়ো অর্থে মানবজাতির কাছে—সুনির্দিষ্ট অর্থে আপন দেশ ও কালের কাছে। বিকারগ্রস্ত মানব-অস্তিত্বকে ঠিক জায়গায় আনার যে-কর্মযজ্ঞ তাতে অংশ নেওয়াই লেখকের কাজ।' এক্ষেত্রে লেখক মার্কসবাদী সাহিত্য মূল্যায়নের প্রসঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত।"[৩]

এই কারণে তাঁর কাহিনি রাঢ়বঙ্গের প্রেক্ষাপটে লেখা হলেও তা প্রেক্ষাপটকে ছাপিয়ে চলে যায়, সাহিত্যরচনার অন্যান্য অনুষঙ্গগুলিও সমানভাবে তাঁর রচনায় গুরুত্বপ্রাপ্ত হয়। তবে মূলত আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষের কথাকেই রাখেন তিনি। উচ্ছ্বাসের নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁর রচনায় সাহিত্যিক উপাদানগুলি ঘনসংঘবদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাঁর কাহিনির বুনোট এই কারণে অনেক জমাট। তাঁর রচনায় বহুমাত্রিকতার পরিচয় পাওয়া যায় ঠিক এই কারণে। এ প্রসঙ্গে 'আত্মজা ও একটি করবীগাছ' ছোটগল্পটির কথা বলা চলে। জীবনবোধের বিভিন্ন স্তরে স্তরায়িত এই গল্পে রাঢ়বঙ্গের প্রসঙ্গ আসে শুধু একটি সংলাপে, একজন হতদরিদ্র বাবা তাঁর মেয়ের শরীর কিনতে আসা স্থানীয় কিছু খদ্দেরদের বলে –

> "... তোমরা না থাকলে না খেয়ে মরতে হতো এই জঙ্গুলে জায়গায়—বুড়ো বলছে, বাড়ির বাগান থেকে অন্ন জোটানো আবার আমাদের কম্ম—হ্যাঃ। ওসব তোমরা জানো। আমরা শুকনো দেশের লোক, বুইলে না? সব সেখানে অন্যরকম, ভাবধারাই আলাদা আমাদের।"[৪]

সমগ্র গল্পে স্থানের উল্লেখ নেই কোনো, শুধু এই একটি সংলাপের বাঙময়তা প্রকাশ করে যে, এটি দেশভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প, উদ্বাস্তুরা 'শুকনো দেশ' থেকে 'জঙ্গুলে জায়গায়' গেছে যেখানে বাড়ির উঠোনে খাদ্য ফলানো হয়। রাঢ়বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের শুধুমাত্র জলবায়ুর উল্লেখে এটি হয়ে পড়ে রাঢ়বাংলার উদ্বাস্তুদের গল্প, পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে যাওয়া মানুষদের গল্প ও পরিস্থিতির চাপে পড়ে তাদের মূল্যবোধের অধঃপতনের গল্প। বহুমাত্রিকতার অন্তরঙ্গ স্তরে দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে রাঢ়বাংলার মানুষদের করুণ কাহিনি এই গল্পে ধরা দেয় শব্দপ্রয়োগের বিশেষ টেকনিকে।

'কল্লোল' পত্রিকার বিশেষ লেখকগোষ্ঠীর অংশ হিসাবে ত্রিশের দশকে বাংলা সাহিত্যের জগতে তারাশঙ্কর আত্মপ্রকাশ করলেও শেষপর্যন্ত কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক হয়ে থাকতে পারেননি। সাহিত্যে অভিনবতার বার্তাবহনে তিনি যথার্থই কল্লোলযুগের লেখক হলেও, কল্লোলগোষ্ঠীর রবীন্দ্রোত্তর নৈরাশ্যবাদিতাকে তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। বরং তাঁর পূর্ব-প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধের প্রতি আস্থা ছিল বেশি। কল্লোলের অন্যান্য লেখকেরা পরিবর্তিত মূল্যবোধের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তাঁদের সাহিত্যচর্চায়, একদম সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ প্রেক্ষাপট থেকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত পরিসর অবধি; সেখানে তারাশঙ্কর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সামাজিক মূল্যায়নের ইতিবাচক দিকটিতে জোর দিয়েছিলেন। এর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'ধাত্রীদেবতা' বা 'গণদেবতা' উপন্যাসে, যেখানে তিনি রাঢ়বঙ্গের সামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষাপটে দেখিয়েছেন, আগ্রাসনী শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদের নেতৃবৃন্দও উচ্চবর্গ থেকেই উঠে আসবে, এবং এটাই যেন তাদের সঠিক দায়িত্ব। রাঢ়বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ব্যবহার করে তিনি এভাবেই নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই সমাজব্যবস্থাটাকে মুছে ভিন্ন বিন্যাস রচনার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। এজন্য ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে তিনি একপ্রকার জোর করেই সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন ও পূর্ব-প্রতিষ্ঠিতের প্রতি বিশ্বাস অবিচল রেখেই তিনি নতুন রাঢ়বঙ্গের স্বপ্ন দেখতেন, যে রাঢ়বঙ্গ তার পূর্ব-প্রতিষ্ঠাকেই আগলে রাখবে এবং নব্য বাণিজ্যিক সংস্কৃতি ও ক্ষমতায়নের আগ্রাসনকে এই ব্যবস্থার দ্বারাই প্রতিরোধ করবে। দীপ্তেন্দু চক্রবর্তীর মতে,

> "সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও সংস্কার এমনভাবে তাঁর মনকে দখল করেছিল যে, তাঁর ঔপন্যাসিক জগতে কোন ব্যক্তিকেই তিনি সেগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দেননি। সেখানে সমাজসেবা আছে, কিন্তু সমাজসংস্কারের স্পৃহা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং সমাজ ভাঙ্গার প্রবণতা আদৌ প্রশংসিত নয়। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, শাশুড়ী-বৌ ইত্যাদি সম্পর্কগুলি তারাশঙ্কর কখনই রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তি-স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেননি—সনাতন সামন্ততান্ত্রিক অভিভাবকত্বের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়েই তিনি ব্যক্তি-মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্বের বিচার করেছেন।... নবীন-প্রবীণের যে সংঘর্ষ তাঁর উপন্যাসের আর এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু, সেখানেও তাঁর সমস্ত সহানুভূতি ছুটে গেছে প্রবীণের ধ্যান-ধারণা অভিজ্ঞতার প্রতি।"[৫]

হাসান আজিজুল হকের নির্মিত রাঢ়বঙ্গ সেই হিসাবে অনেক বেশি সমকালীন চেতনা-সংলগ্ন। সামাজিক কাঠামোর তুলনায় তাঁর সমাজের মানুষদের উপর আস্থা ছিল বেশি। তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা'র শিবু, 'গণদেবতা'র দেবু ঘোষ বা 'কালিন্দী'র অহীন্দ্র সমাজ-কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত নায়ক। কিন্তু হকের 'জীবন ঘষে আগুন' ছোটগল্পের চরিত্রদের দেখা হয়েছে মানুষের জীবনসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে। এখানে নায়ক সেই, যে তার নিজের জীবন থেকে সেই আগুন জ্বালাতে পারবে। তাদের সবার সামাজিক অবস্থান আলাদা। কেউ মুসলমান, কেউ হিন্দু, কেউ উচ্চবর্গীয় হিন্দু, কেউ নিম্নবর্গীয় বাগদী সম্প্রদায়, কিন্তু সমাজে কারোর অবস্থান নির্ধারিত নয়, যুদ্ধের ময়দানে নামলে যে কারোর জয়ই নিশ্চিত হতে পারে। তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' উপন্যাসে কালিন্দীর বুকে জেগে ওঠা চরের মালিকানা প্রথমে যায় সাঁওতালদের হাতে, তারপর কৃষক সম্প্রদায়ের জমিদারের হাতে, অবশেষে মিল-মালিকের হাতে। এই উপন্যাসের মাধ্যমে তারাশঙ্কর সভ্যতার বিবর্তনের একটি ক্ষুদ্র চিত্র কালিন্দীর বুকে জেগে-ওঠা মালিকানাহীন চরের ইতিহাস বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ করে দেন। কিন্তু হাসান আজিজুল হকের রাঢ়বঙ্গের গল্পে এই হস্তান্তরের ঘটনা কালের নিয়মে নির্ধারিতভাবে আসে না। অত্যাচারিতের অত্যাচারিত জীবন থেকে ছিটকে আসা আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকেই নতুন সমাজব্যবস্থা নির্ধারিত হতে পারে। হকের এই জীবন-দর্শন অনেকাংশে সমকালীনতা প্রভাবিত। তবে এই জীবন-দর্শন মূলত বামপন্থা-আশ্রিত, তিনি তাঁর লেখক-সত্তায় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবকে অস্বীকার করলেও বামপন্থার আংশিক প্রভাবকে অস্বীকার করেননি। চন্দন আনোয়ারের মতে,

> "তাঁর মতে, সাহিত্য শতভাগ নিরপেক্ষ হতে পারে না। কারণ, সমাজের সঙ্গের লেখকের সম্পর্ক একমাত্রিক নয়। লেখকের ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া, রুচি-অরুচি যেমন তাঁর লেখায় থাকবে, তেমনি সমাজও দাবি খাটাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখক সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রয়োগকে সমর্থন করেন। কারণ মার্কসবাদ নিছক কোনো তত্ত্ব নয়, এর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সমাজ-বিপ্লবের বাস্তবভিত্তিক ও কর্মভিত্তিক নির্দেশনা। তথাকথিত প্রতিষ্ঠানবিরোধী বা সমাজবিপ্লবী সাহিত্যিকের মতো তিনি তাঁর লেখায় ম্যাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলার বিপক্ষে। তিনি বরং ধীর-শান্তভাবে লক্ষ্যটাকে স্থিত্র করেন, লড়াইয়ের ক্ষেত্র ও ধরনটিকে নির্দিষ্ট করেন, তারপর লড়াইয়ে নামেন। তাঁর কাছে প্রতিষ্ঠান শত্রু নয়, বিবেচ্যও নয়। তাঁর কাছে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর একটা কিছু। বরং প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতাকে তিনি বঞ্চিত মধ্যবিত্তের ঘ্যানঘ্যানি বা অভিযোগ বলে মনে করেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রের লক্ষ্য নির্দিষ্ট, আঘাতের জায়গা নির্দিষ্ট, তারা লক্ষ্যে পৌঁছে অব্যর্থ আঘাত হানতে সমর্থ। এক্ষেত্রে, মার্কসবাদ লেখককে সহায়তা করে।"[৬]

এই আলোচনায় স্পষ্ট যে, হাসান আজিজুল হক কোনো প্রতিষ্ঠানকে অনুসরণ করলেও সেই প্রতিষ্ঠানের চলতি সমস্ত পন্থাকেই অন্ধভাবে অনুকরণ করতেন না। শুধু সেটুকু গ্রহণ করতেন, যেটুকু তাঁর যথার্থ বলে মনে হত। সাহিত্যে মানুষের জীবনসংগ্রাম ফুটিয়ে তুলতে মার্কসবাদের সাহায্য নিয়েছেন মাত্র। কিন্তু মার্কসবাদী সাহিত্যিক হয়ে ওঠেননি। শেষ-অবধি তিনি শিল্পীই থেকে যান। এজন্যেই তাঁর রাঢ়ের কাহিনিকে মার্কসবাদী সাহিত্য বলা যাবে না, কিন্তু সমষ্টির সংগ্রাম যেখানে আছে (যেমন, 'জীবন ঘষে আগুন'), সেখানে তিনি মার্কসবাদী চেতনা দ্বারা প্রভাবিত অবশ্যই।

লোকায়ত সংস্কৃতি ও লোকজীবন বর্ণনাতেও দুইজন লেখকের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তারাশঙ্কর মূলত রাঢ়বঙ্গের রোমান্সধর্মী কথকতায় আগ্রহী। তাই তিনি রাঢ়বঙ্গের সমৃদ্ধ লৌকিক জীবনের সমৃদ্ধ লোকায়ত আচার অনুষ্ঠান বিশ্বাসের বর্ণাঢ্য পরিচয় দিয়ে থাকেন। 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য় কোশকেঁধে ও কাহারদের পরিচয়ে, 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-এর বেদে সম্প্রদায়ের স্থিরবেদে, বিষবেদে, ইসলামী বেদে, মেটেল বেদে ইত্যাদি বিভিন্ন বেদে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা বর্ণনায়, 'কবি' উপন্যাসের দৈত্যকূলের প্রহ্লাদ নিতাইয়ের সেই দৈত্যকূলের বর্ণনায়, 'কালিন্দী' উপন্যাসের সাঁওতালদের জীবনযাপন বর্ণনায় লোকজীবনের পুরাণ, কাহিনি, গান, বিশ্বাসের বিস্তৃত উল্লেখে পাওয়া যায় আদিম অপরিবর্তিত প্রাণোচ্ছল কৌম-সমাজের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। হাসান আজিজুল হকের রাঢ়বঙ্গের গল্প 'জীবন ঘষে আগুন'-এ লোকাচার ও লোকউৎসবের উল্লেখে দেখা যায় তা আসলেই ভূমিদখলের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তেঁতুলে বাগদীদের জমিহরণের জন্য উচ্চবর্গীয় যুবকদের আয়োজিত হলকর্ষণ মহোৎসবের চিত্রকে তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে,

> "ষাঁড় দুটি নতুন উদ্যমে উন্মত্ত প্রায়, তাঁদের সবল লিকলিকে কেঠো কেঠো পা-গুলি প্রায়শই শূন্যে। এটিও যুবকবৃন্দের কাছে খুবই আনন্দদায়ক, কারণ এর মধ্যে মায়েরই ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং বিশ্বাস তাতে মঙ্গল অবধারিত। এখন শত চেষ্টাতেও ষণ্ড দুটির নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। মায়ের আশীর্বাদে তারা কি তীব্র গতিতে দৌড়ায়—যেন এখানে বহু বর্গমাইলব্যাপী চতুর্দিকের যাবতীয় কৃষিক্ষেত্র তারা স্পর্শ করবে, পরিক্রমণ করবে, তাঁদের হৃদপিণ্ড টুকরো টুকরো হলেও তারা বিরত হবে না।"[৭]

তেঁতুলে বাগদীরা বাধা দেয়, কিন্তু সঠিক সময়ে বৃষ্টি এসে যায় ও 'আধাবাবু আয়েসি যুবকগুলি' আনন্দে মাঠে ষাঁড় নিয়ে দৌড়তে থাকে। অতিলৌকিকের ভয়ে বাগদীরা তাদের জমি ছেড়ে দেয়। কিন্তু হঠাৎ একটি ষাঁড়ের পায়ে লাঙলের ফলা ঢুকে পুরো আয়োজন নষ্ট হয়,

> "এই ভাবেই শুভ হলকর্ষণের মহোৎসব ছিঁড়ে ফেটে টেঁসে যায়।"[৮]

এরপর আধাবাবুদের মধ্যে থেকে ঘন্টা নামের যুবকটি আবার তেঁতুলে বাগদীদের পাড়াতেই যায় মেয়েমানুষের লোভে। কিন্তু বাগদীরাই তাকে ধরে ফেলে পিটিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বলে,

> "সবই আক্রা গঁ—শুধু মেয়েমানুষ শস্তা, লয়? শালো কুকুরের জন্মিত শুয়োর, মজাটো বোঝ কেনে এখুন। শালোকে ভদ্দরনোক পাড়ার পাঁচ-গড়েতে দিয়ে আসি—নাকি গঁ—আঁ?"[৯]

হকের রচনায় লোকায়ত আচার তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত নয়। তা সুযোগসন্ধানী শ্রেণির লোভী আগ্রাসনের উপলক্ষ্যমাত্র। তেমনই সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের বাস্তবতা তাঁর রচনায় ভিন্নভাবে পাওয়া যায়। উচ্চবর্গীয়দের শ্রেণি প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উত্তমগুণ-সম্পন্ন চরিত্র তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। তাঁর রচনায় রাঢ়বঙ্গের বাস্তব ভিন্নভাবে ধরা দেয়। এখানে শ্রেণিদ্বন্দ্ব বাধে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে, কোনো পূর্বগঠিত সামাজিক বিন্যাসকে ধরে রাখার জন্যে নয়। তারাশঙ্করের চরিত্ররা হত মূলত টাইপ চরিত্র, কোনো চরিত্রকে তার সামাজিক বা পারিবারিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হতে তিনি দিতেন না। কিন্তু হাসান আজিজুল হক চরিত্র নিয়ে ভাঙা-গড়া করতেন মূলসত্যটিকে আখ্যানের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য। তাঁর আখ্যানে সামাজিক অবস্থান চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতো না, চরিত্রের বা সমষ্টির কৃতকর্ম সমাজে তার বা তাদের স্থান নির্ধারণ করে দিত। তাই আধাবাবু ঘন্টাকে বাগদিরা পেটায় তার চারিত্রিক অবনমনের জন্য, আবার উচ্চবর্গীয়দের সমষ্টিগত চারিত্রিক অবনমনের জন্য উচ্চবর্গীয়ের প্রতি তারা বিন্দুমাত্র সম্মান প্রদর্শন করে না।

তারাশঙ্করের আখ্যান রচনায় পূর্বসূরীদের বহুল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চরিত্রচিত্রণে কিংবা ঘটনাবর্তের ফলাফল বিশ্লেষণে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখ পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। সাহিত্যরচনায় তিনি ব্রতী হয়েছেন প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। বারংবার পূর্বজদের অনুসরণ করতে গিয়ে কোথাও কোথাও তিনি অতিবাস্তবতার ব্যবহার করে ফেলেন, যা দেখা যায় তাঁর 'রাধা' উপন্যাসে কৃষ্ণদাসীর ট্র্যাজিক পরিণতিতে। বৈষ্ণব সাধনায় ব্যভিচার ঘটানোর অপরাধে কৃষ্ণদাসী পাগলিনী হয়ে রাতারাতি শ্মশান থেকে উধাও হয়ে হারিয়ে যায়। তার এই পরিণতি কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিনীর পরিণতিকে মনে করায়। অপরদিকে হাসান আজিজুল হক নিজেই বলেছেন যে, তিনি কারোর দ্বারা প্রভাবিত নন। তাঁর গল্পের বিশ্ব একান্ত ভাবেই তাঁর "লেখকের উপনিবেশ", এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন,

> "আমার কোনো দীক্ষা নেই। বিখ্যাত বিখ্যাত গল্পগুলো আমি অনেক পরে পড়েছি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলো ছাড়া মানিক, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, সতীনাথ এঁদের গল্প আমি অনেক পরে পড়েছি। কাজেই এঁদের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।আমার ইঞ্জিনে কেউ কয়লা দেবে না, বুঝলে? আমার ইঞ্জিনে যতটুকু গ্যাস আছে সেই গ্যাসেই আমার চলতে হবে। এজন্যেই বলি, আমার গল্পে কারো দীক্ষা নেওয়ার ব্যাপার তেমন কখনই ঘটেনি।"[১০]

হকের রাঢ়বঙ্গের গল্পে এই কারণে নতুনত্বের চমক দেখা যায়। তিনি রাঢ়বঙ্গের আখ্যান নিজস্ব ভঙ্গিমায় পরিবেশন করেন। বহুমাত্রিকতাকে এই কারণেই বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর রচনায় খুঁজে পাওয়া যায়।

তারাশঙ্কর হলেন মূলত মহাকাব্যকার, আর হাসান আজিজুল হক হলেন ছোটগল্পকার। তারাশঙ্কর রচিত ছোটগল্পগুলিও প্রমাণ করে তিনি মূলত মহাকাব্যের ঢঙেই ছোটগল্পের পরিসরে আখ্যান পরিবেশন করতে পছন্দ করেন। এ ব্যাপারে তিনি বঙ্কিমীয় টেকনিককে বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন। মহাকাব্যের আঙ্গিকে রাঢ়বঙ্গের গল্পকে

রোমান্সধর্মী ইতিকথা, উপকথার মোড়কে পরিবেশন করতেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন তিনি। তাই তাঁর বর্ণনায় কখনো কখনো আখ্যানকে ছাপিয়ে যায় আখ্যানের অন্যান্য অনুষঙ্গগুলি। চরিত্রের পরিস্ফুটনে এই বিচ্যুতি বারবার চোখে পড়তে থাকে। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে শিবুর বৌয়ের আকস্মিক চৈতন্যোদয়ে, 'রাধা' উপন্যাসে মাধবানন্দের আকস্মিক মোহিনীর প্রতি অত্যন্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ায়, কিংবা 'কবি' উপন্যাসে কাশী চলে যাওয়ার পর নিতাইয়ের জীবনে বসন্ত বা ঠাকুরঝির স্মৃতির বদলে রাঢ়দেশের স্মৃতির অধিক গুরুত্ব আখ্যানভাগের এই বিচ্যুতিগুলিকে আরো পরিস্ফুট করে। এরকম অজস্র উদাহরণ তাঁর রচনায় পাওয়া যাবে। এই বিচ্যুতি পূর্বোক্ত 'কবি' উপন্যাসের শেষাংশে যেরকম দেখা যায়, তেমনই দেখা যায় ইতিহাসাশ্রিত 'রাধা' উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপাদানগুলির মূল আখ্যানভাগের সঙ্গে গ্রন্থনের প্রচেষ্টায়। এখানে দিল্লির মসনদের ক্ষমতাবদল, রাঢ়বঙ্গে বর্গীর হানা ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চিত্র চিত্রণের প্রচেষ্টাতে প্রতিটি বিষয় আলাদা হয়ে থাকে, যদিও তারাশঙ্কর মেলাতে চেয়েছেন শৈল্পিক কুশলতায়। পাপের পঙ্কে ডুবে থাকা ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের দাস-সরকারের ক্ষমাহীন নৃশংস মৃত্যু হয় বর্গীদের হাতে, এমনকি রসসাধনার নামে ব্যভিচারে ভরা সমগ্র পাপে পূর্ণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়টিকেই তিনি রাঢ় থেকে উচ্ছেদ করিয়েছেন বর্গীদের হাতে। এ যেন বঙ্কিমের মহাকাব্যিক প্যাটার্ন, সিস্টেমের বাইরে বেরিয়ে পাপাচারে মত্ত হলে তার হয় নির্দয় বিনাশ। সবক্ষেত্রেই এই বিচ্যুতিগুলোর কারণ হল তারাশঙ্কর একটি নির্দিষ্ট সময়ে আখ্যানের গতিময়তাকে রুদ্ধ করে মহাকাব্যিক প্যাটার্নের দিকে গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিতে চান। যা ঘটবে, তা তাঁর পূর্ব-নির্ধারিত থাকে, ফলে আখ্যানের গ্রন্থনে বিচ্যুতি রয়ে যায়। সমগ্র রাঢ়বঙ্গেরও একটি টাইপ-চরিত্রকেই তিনি আসলে নির্মাণ করতে চান। টাইপ-চরিত্র নির্মাণের প্রবণতা আসলে মহাকাব্যিক আখ্যানেরই একটি বিশেষ লক্ষণ। অপরদিকে, ছোটগল্পকার হাসান আজিজুল হকের আখ্যানভাগের গ্রন্থনে জীবনবোধের অনুভব ক্ষমতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি, যা ছোটগল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এমনকি তাঁর উপন্যাস 'আগুনপাখি'তেও সেই সংবেদনশীলতার উপস্থিতি দেখা যায়। উপন্যাসে প্রায় প্রতিটি লাইনেই পাওয়া যায় গভীর জীবনোপলব্ধি। তাঁর রচনায় প্রয়োজন-বিশেষে মানুষ একক ব্যক্তি-চরিত্র, আবার কখনো সমষ্টি-চরিত্র। তবে কখনোই শুধুমাত্র সমষ্টিরই অংশ নয়। টাইপ-চরিত্রের ধারণাটিকে তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন ঠিকই, আবার উপেক্ষাও করেননি। যেজন্য, 'আগুনপাখি'র কথক নারী বা 'আত্মজা ও একটি করবীগাছ'-এর বৃদ্ধ পিতা টাইপ-চরিত্রের সমস্ত সংজ্ঞা ভেঙ্গে দিয়েছে, আবার 'জীবন ঘষে আগুন'-এর আধাবাবু ঘণ্টা অথবা প্রতুল, তেঁতুলে বাগদি সম্প্রদায়, মুসলমান সম্প্রদায়, 'আত্মজা ও একটি করবীগাছ'এর ধর্ষকেরা টাইপ-চরিত্রের ধরণকে ভিন্নমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'আগুনপাখি' উপন্যাসে পাওয়া যায় ছোটগল্পধর্মিতা, অথচ তা উপন্যাস; আবার 'জীবন ঘষে আগুন'-এর ধরন মহাকাব্যিক, অথচ তা ছোটগল্প। আখ্যান রচনায় এভাবেই প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞাগুলির বাইরে গিয়ে হক রচনা করেছেন রাঢ়বঙ্গের বহুমাত্রিক সামাজিক-রাজনৈতিক আখ্যান। চন্দন আনোয়ারের ব্যাখ্যায়,

> "জীবনের যেহেতু পূর্বনির্ধারিত কোনো সংজ্ঞা নেই, তাই জীবন থেকে সংগৃহীত গল্প-উপন্যাসেরও পূর্বনির্ধারিত কোনো সংজ্ঞা তিনি মানেননি। বস্তুত জীবন কখনওই কোনো আদর্শ সরলরেখা মেনে চলে না, তেমনি আদর্শ গল্প-উপন্যাস লেখা কখনওই সম্ভব হয় না। বড়ো শিল্পী মাত্রই চেষ্টা করেন জীবনাদর্শের যতটা সম্ভব কাছে পৌঁছানোর। হাসান আজিজুল হকও সে-চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তিনি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য নীতি বা আদর্শের কোনো উপদেশ বা যে-কোনো ধারণাকেই প্রত্যাখ্যান করেন।"[১১]

নারী চরিত্রের নির্মাণের মধ্যে দিয়েও দুই রচনাকারের রাঢ় অঞ্চলের আখ্যানের লিখনশৈলীর স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তারাশঙ্করের নায়িকাকেন্দ্রিক উপন্যাস 'রাইকমল'-এ নায়িকা রাইকমল লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি। রাইকমল রাঢ় অঞ্চলের একজন বৈষ্ণবী সাধিকা, কিন্তু 'রাধা' উপন্যাসের কৃষ্ণদাসীর মত ব্যভিচারিণী নয়। এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে যেন রাঢ় অঞ্চলের বাস্তবের মাটি থেকে উঠে আসা বৈষ্ণবীকেই উপস্থাপিত করেছেন তারাশঙ্কর। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবীর চরিত্র বিরল নয়। রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী' গল্পের বৈষ্ণবী চরিত্রটি রাবীন্দ্রিক ভাবালুতার সৃষ্টি, তার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। আবার শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কমললতা বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট বৈষ্ণবী চরিত্র হলেও তা শরৎচন্দ্রের বানিয়ে তোলা চরিত্র, বাস্তব-বিচ্ছিন্ন চরিত্র, বাস্তবের বৈষ্ণব সাধিকা সে নয়। সেই হিসাবে রাঢ়বাংলার বৈষ্ণব সাধিকা রাইকমলের গুরুত্ব অনেক, কারণ জয়দেবের কেন্দুলির স্থানমাহাত্ম্য-বিজড়িত রাঢ় অঞ্চলের মাটি থেকে উঠে

আসা মানুষ সে, এখানকার বৈষ্ণব সংস্কৃতিকে, প্রাচীন স্থানমাহাত্ম্যকে সে উপস্থাপিত করেছে এই উপন্যাসের মাধ্যমে। একইরকমভাবে নারীচরিত্রের মাধ্যমে রাঢ়বাংলাকে, এখানকার জীবনযাপন, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, লোকবিশ্বাসকে তুলে ধরতে দেখা যায় হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' উপন্যাসে একটি নারীচরিত্রের মাধ্যমে। এই উপন্যাস সেই নারীর বয়ানে উত্তম পুরুষে রাঢ়ের কথ্য বাংলাভাষায় লেখা, ফলে উপন্যাসের আবেদন হয়ে গেছে আরো মর্মস্পর্শী। তবে 'আগুনপাখি'তে কেন্দ্রীয় চরিত্র নারীটি শেষ অবধি শুধু রাঢ় অঞ্চলের এক অভিজাত মুসলিম পরিবারের একজন সাধারণ গৃহবধূ হয়ে থাকেনি, সে দেশভাগের বিরোধিতা করে অবশেষে হয়ে উঠেছে একজন বিশ্বনাগরিক। 'রাইকমল' উপন্যাসের শেষে রাইকমল হয়ে থাকে রাঢ়বঙ্গেরই এক বিরহী নায়িকা, রাধার প্রতিভূ,

> "অজয়ের নির্জন তীর, নিজের গান সে নিজেই শোনে। সব সারিয়া গাছতলার ঘর ভাঙিয়া আবার সে পথ চলে।"[১২]

রাঢ়বঙ্গের বুকে বুকে রাইকমল রাধার মত বিরহী নায়িকা হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। সেই হিসাবে বলা যায়, রাইকমল চরিত্রটি রাঢ়বঙ্গের বৈষ্ণবী চরিত্রের একটি যথার্থ টাইপ-চরিত্র হয়ে ফুটে উঠেছে। অপরদিকে, 'আগুনপাখি'র নারীটিও উপন্যাসের শেষে রাঢ়বঙ্গে একা থেকে যায়, কিন্তু বিরহী হয়ে নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঔজ্জ্বল্যে একজন "আলেদা মানুষ"-এর পরিচয়ে। মূলত, 'রাইকমল' উপন্যাসে রাঢ়বঙ্গের প্রেক্ষাপটে ট্র্যাজিক প্রেমের কাহিনি লিখেছেন তারাশঙ্কর। বিভিন্ন চরিত্রের সম্পর্কের সূক্ষ্ম টানাপোড়েনে আন্দোলিত হয়েছে উপন্যাসের মূল কাহিনিসূত্র। তার সঙ্গে যথার্থ প্রতিবেশ তৈরি করেছে রাঢ়বঙ্গের প্রকৃতি, সেখানকার মানুষের সামাজিক জীবনযাত্রা ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো। তাই 'রাইকমল' মূলত রাঢ়বঙ্গের বৈষ্ণব সমাজের গল্প, পাঠকের সঙ্গে এখানকার সুপ্রাচীন বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় হয় এই উপন্যাসের মাধ্যমে। কিন্তু ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'রাইকমল' উপন্যাসের রচনাকালে দেশভাগ বলে কোনো রাজনৈতিক ঘটনার অস্তিত্ব ছিল না। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'আগুনপাখি' উপন্যাসের সঙ্গে এখানেই পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়। আগুনপাখি উপন্যাসে রাঢ়বঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হলেও তা আসলেই দেশভাগের সাহিত্য, হাসান আজিজুল হক একজন ডায়াস্পোরা সাহিত্যিক[১৩], তাই শুরুতে গুরুত্ব পেলেও শেষ অবধি রাঢ়বঙ্গ এই উপন্যাসের মুখ্যভাগে থাকে না। তারাশঙ্কর রাঢ়বঙ্গকে স্বদেশ হিসাবে ভেবেছিলেন, তাঁর রচনায় তাই পাওয়া যায় সেই নিশ্চয়তা, পাওয়া যায় শুধু একান্ত রাঢ়বঙ্গেরই কথকতা। তাঁর চরিত্ররাও সম্পর্কে ট্র্যাজিক পরিণতির পর অজয়ের তীরেই বিরহীর মত ঘুরে বেড়ায়, বা বিদেশে চলে গেলে শুধু দেশের জন্য তাদের পিছুটান রয়ে যায়। কিন্তু, হাসান আজিজুল হকের লেখায় ডায়াস্পোরা সাহিত্যের নিয়ম মেনে প্রথমে রাঢ় গুরুত্ব পায়, তারপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রসঙ্গগুলি নানাভাবে রাঢ়বঙ্গের ঘটনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অংশের মত জুড়ে যেতে থাকে, এবং অবশেষে দেশ-কালের সীমানা ভেঙ্গে দিয়ে উপন্যাসের মূল চরিত্রটি বিশ্ব-পরিচয়ে পরিচিত হয়ে যায়, আর আলাদা করে কোনো দেশের পরিচয়ের গন্ডিতে সে আর থাকে না। এখানেই 'আগুনপাখি' রাঢ়বঙ্গের আখ্যানকে ছাপিয়ে হয়ে ওঠে দেশভাগের আখ্যান। তবে রাঢ়বঙ্গের মাটির মানুষ হিসাবে গৃহবধুটির পরিচিতি যতক্ষণ ছিল, কেবল ততক্ষণই সে ছিল বাস্তব একটি চরিত্র। তার দেশভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, পূর্ব পাকিস্তানে যেতে না চাওয়া লেখকের নিজস্ব সৃষ্টি, যা বাস্তব-বিচ্ছিন্ন। ফলে তারাশঙ্কর যখন কাহিনির গতিবেগ রাঢ়মুখী করতে চান, আবার হাসান আজিজুল হক যেখানে আখ্যানকে রাঢ়বঙ্গের গন্ডি থেকে ভেঙে বের করতে চান, উভয়-প্রচেষ্টাই আখ্যানের সহজ গতিময়তাকে প্রভাবিত করেছে।

তারাশঙ্কর ঘটমান বর্তমানের বদল নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঐতিহ্যের অনুসারী। যে রাঢ়বাংলার রূপকে তিনি বিশ্বাস করতেন, তাকেই সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন বারবার। পরিবর্তনকে ধরে রাখতে চাননি। জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> "যে রাঢ়ভূমির সন্তান তিনি, তার ভিত্তিমূলের রহস্য উদ্ধারই তাঁর কাজ। তারাশঙ্কর বুঝেছিলেন রাঢ়ের মৃত্তিকাগঠন, সাংস্কৃতিক সন্নিবেশ, জল হাওয়া এবং লোকজীবনধারার মধ্যে বহুকালীন সমন্বয়ধারার একটা ইতিহাস আছে। সেই ঐতিহ্যের দ্বারোদঘাটনই তাঁর প্রথম দায়।"[১৪]

হাসান আজিজুল হকের লেখার কিন্তু পরিবর্তনের ছবিই ঘটনা পরম্পরায় পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনাগুলি রাঢ়বঙ্গের বুকে কিভাবে প্রভাব ফেলেছে তার সার্থক চিত্র পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। তারাশঙ্কর

জীবদ্দশায় দেশভাগ, দাঙ্গা সবকিছুরই সাক্ষী থেকেছেন। কিন্তু সাহিত্যে তার কথাকে গুরুত্ব দেননি। সাতচল্লিশের দেশভাগের পরবর্তী সময়ে পঞ্চাশের দশক থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বা ইতিহাসাশ্রিত আখ্যান রচনার যে চল হয়েছিল, তিনি তাতেই স্বচ্ছন্দ হয়েছিলেন। এমনকি রাঢ়বঙ্গের কথকতা থেকে সরে এসে কলকাতার নগরজীবন-কেন্দ্রিক উপন্যাসও কিছু লেখেন। তাঁর শেষ উপন্যাস 'কীর্তিহাটের কড়চা', যা তাঁর মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে, তাতেও তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর জমিদারী প্রথার স্বর্ণযুগের কাহিনি রচনা করে গেছেন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত সময়ের পর, বিশেষ করে দেশভাগের পর বাংলার জনজাতির বসবাসের বিন্যাসে পরিবর্তন আসে। স্বদেশ, বিদেশের ধারণায় পরিবর্তন আসে। স্বদেশ ভেবে একটি স্থানের বর্ণনা দেওয়া আর স্বদেশচ্যুত হয়ে তাকে অন্য একটি দেশ বানিয়ে পরবর্তীকালে অতীতের সেই স্বদেশের বর্ণনা দেওয়া, দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। এইজন্য দেশভাগের কারণে জনজাতির বসবাসের বিন্যাসের পরিবর্তনের চিত্র হাসান আজিজুল হকের রচনায় অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। কারণ 'আগুনপাখি' উপন্যাসে দেখা যায় রাঢ়বঙ্গের বর্ণনার সঙ্গে তিনি তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দেশভাগ, দাঙ্গার প্রসঙ্গগুলিও তুলে ধরেন। তাঁর রাঢ়বঙ্গের স্মৃতিতে দেশভাগ-দাঙ্গা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যে কারণে রাঢ় তাঁর কাছে অন্য দেশে পরিণত হয়েছে, তাঁর রাঢ়বঙ্গকে সেই কারণগুলি থেকে তিনি আলাদা করে দেখেন না।

হাসান আজিজুল হকের রচনায় প্রকৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বিখ্যাত সব রচনায়, যেমন- 'শকুন', 'আত্মজা ও একটি করবীগাছ', 'নামহীন গোত্রহীন' সর্বত্রই উপমা, অলঙ্কার, চিত্রকল্প ও রূপকল্পের আধার হিসাবে প্রকৃতির ব্যবহার চমকপ্রদ। কিন্তু রাঢ়বঙ্গের গল্প 'আগুনপাখি'তে প্রকৃতির সেই ব্যবহার সংযত, নেই বললেই চলে। তার একটি কারণ, এটি একজন নিরক্ষর গৃহবধূর বয়ানে বর্ণিত, নিজের সংসারের বাইরের জগৎটা তার তাকিয়ে দেখা হয়ে ওঠেনি কখনো; এবং অপর একটি কারণ, এটি আসলেই দেশভাগের সাহিত্য। তাই রাঢ়বঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে না। অপরদিকে, তারাশঙ্করের রাঢ়বঙ্গের প্রকৃতি তাঁর উপন্যাসগুলির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রায় প্রতিটি উপন্যাস শুরুই হয়েছে রাঢ়বঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনার দ্বারা। রাঢ়বঙ্গের প্রকৃতি রাঢ়বঙ্গের গল্পে ঘনসন্নিবিষ্ট অবস্থায় থাকে, গল্পের আবেদনে এক অন্য মাত্রা যুক্ত করে। তার ছোট একটি উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে রাইকমল উপন্যাসের সূচনায়,

> "হলুদমণি পাখি—বাংলা দেশের অন্যত্র তাহারা 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলিয়া ডাকে, এখানে আসিয়া তাহারা সে ডাক ভুলিয়া যায়—'কৃষ্ণ কোথা গো' বলিয়া ডাকে।"[১৫]

প্রকৃতির সাহায্যে বৈষ্ণব রসসাধনার আবহ বোঝাতে এ এক চমকপ্রদ উপমা।

'আগুনপাখি' উপন্যাসের প্রথমাংশে মহিলাটির পরিবারের বর্ধিষ্ণু অবস্থা দেখানো হয়েছে, তারপর দ্বিতীয়াংশে তাদের অবস্থারও পতন হতে থাকে ও একে একে রাঢ়বঙ্গের বুকে আছড়ে পড়তে থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন আকাল, কলেরার প্রকোপ, ফসলের ঘাটতি, খরা, অতিবৃষ্টি, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং অবশেষে দেশভাগ। তাই দ্বিতীয়ভাগে উপন্যাসের মূল ধারায় রাঢ়বঙ্গ আর মুখ্য থাকে না, সাম্প্রতিক সমস্যাগুলোই মুখ্য হয়ে ওঠে, তারপর একান্নবর্তী পরিবারের পৃথগন্ন হওয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতভাগের ইতিহাসটি প্রচ্ছন্ন রূপকাশ্রিতভাবে বলা হয়, এবং অবশেষে দেশভাগের প্রসঙ্গ প্রকট হয়ে ওঠে। 'আগুনপাখি' শুধু রাঢ়বঙ্গের গল্প নয়, বরং রাঢ়বঙ্গের প্রেক্ষাপটে সমগ্র বিশ্বের গল্প। কথক নারীর সরল জবানবন্দিতে রয়েছে সমকালীন সময়ের নানা জটিল ইতিহাস। উপন্যাসের দ্বিতীয়াংশে রাঢ়বঙ্গের চিত্র পাওয়া যায়,

> "...পড়তে লাগলম, শুনতেও লাগলম কটি নাম—জিন্না, নেহেরু, গান্ধি, প্যাটেল। এমন নাম তো জেবনে শুনি নাই, কিছুতেই মনে থাকত না যেদি হাটে মাঠে ঘরে বাইরে সব সোমায় এই নামগুলিন না শুনতে পাওয়া যেত।"[১৬]

রাঢ়বঙ্গের ভূমিপুত্র তারাশঙ্করও রাঢ়বঙ্গের হাটে মাঠে নামগুলি নিশ্চয়ই শুনেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক জগৎকে বিদায় দিয়েই তাঁর সাহিত্যের জগতে আসা। তাই এই রাঢ়বঙ্গ তাঁর সাহিত্যে অনুপস্থিত। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট দলের আদর্শগত বিরোধিতার দিকটি, কিংবা কলকাতার ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিত্র

তারাশঙ্করের 'উত্তরায়ণ' উপন্যাসে পাওয়া যাবে, কিন্তু তা রাঢ়ের প্রেক্ষপটে নয়; আবার 'উত্তরায়ণ' আসলেই রাজনৈতিক উপন্যাস নয়, সম্পর্কের টানাপোড়েনের গল্প, তাই এই সমকালীন ঘটনাগুলো উপন্যাসের মুখ্য হয়ে ওঠে না, অনুষঙ্গ হয়ে থাকে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও হাসান আজিজুল হক দুই সাহিত্যিকের কলমেই রাঢ়বঙ্গ ফুটে উঠেছে বিচিত্ররূপে। তারাশঙ্কর তাঁর প্রাচীন রাঢ়বঙ্গের চিরায়ত আদি অকৃত্রিম রূপটিকেই ধরে রাখতে চান, ভুলতে দিতে চান না এর আড়ম্বরপূর্ণ দেশজ ঐতিহ্যকে, এর লোকায়ত ইতিহাসকে, সমৃদ্ধ অতীতকে। আবার হাসান আজিজুল হক তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ধরে রাখতে চান তাঁর শৈশব কৈশোরের স্মৃতি-বিজড়িত সেই সমৃদ্ধ অঞ্চলকে, তার সঙ্গে জুড়ে দিতে চান মানবসভ্যতার জটিল কিছু ইতিহাসকে। এভাবে তিনি অন্তরে যে স্থানের সঙ্গে নাড়ির টান অনুভব করেছেন, সেই রাঢ়বঙ্গের প্রতি তাঁর সংবেদনশীলতাকে বাড়িয়ে তুলতে চেয়েছেন। তারাশঙ্করের "পশ্চিম বাংলার রাঢ় দেশ" জানতো,

> "সুখ দুখ দুটি ভাই, সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি, দুখ যায় তারই ঠাঁই।"[১৭]

আবার 'আগুনপাখি'র বধূটি বলেছে,

> "সোংসার সুখ-দুখের দুই সুতোয় বোনা বই-তো লয়।"[১৮]

দুই সাহিত্যিকেরই রচনায় রাঢ়বঙ্গের জীবনবোধকে ফুটিয়ে তুলতে এই জীবনসত্যটি প্রকাশে ব্যত্যয় ঘটেনি।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত, "তারাশঙ্করের শিল্পস্বভাব", *তারাশঙ্করের 'রাধা': একটি সমীক্ষা,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, পৃ. ১২
২. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, "তারাশঙ্করের কবি, পুনর্মূল্যায়ন", *তারাশঙ্কর অন্বেষা,* কলকাতা, রমা প্রকাশনী, ১৯৫৮, পৃ. ১৭
৩. চন্দন আনোয়ার, "হাসান আজিজুল হকের শিল্পীসত্তার স্বরূপ", *কালি ও কলম,* দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৬
৪. হক, হাসান আজিজুল, "আত্মজা ও একটি করবীগাছ", *হাসান আজিজুল হক গল্পসমগ্র,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০০৩, পৃ. ১১৯
৫. চক্রবর্তী, দীপ্তেন্দু, "তারাশঙ্করের সমাজচেতনা ও তাঁর সাফল্য", *তারাশঙ্করের দেশ কাল সাহিত্য,* কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৬৫, পৃ. ১৬-১৭
৬. আনোয়ার, চন্দন, "হাসান আজিজুল হকের শিল্পীসত্তার স্বরূপ", *কালি ও কলম,* দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৮
৭. হক, হাসান আজিজুল, "জীবন ঘষে আগুন", *হাসান আজিজুল হক গল্পসমগ্র,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০০৩, পৃ. ২৩০
৮. ঐ, পৃ. ২৩২
৯. ঐ, পৃ. ২৪৪
১০. আনোয়ার, চন্দন, "মুখোমুখি হাসান আজিজুল হক", *কালি ও কলম,* ত্রয়োদশ বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১২
১১. আনোয়ার, চন্দন, "হাসান আজিজুল হকের শিল্পীসত্তার স্বরূপ", *কালি ও কলম,* দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৬
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, "রাইকমল", *তারাশঙ্কর রচনাবলী,* তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৫৮, পৃ. ৪৩৯
১৩. ডায়াস্পোরা সাহিত্য- 'ডায়াস্পোরা' শব্দের অর্থ দেশান্তরে গমন। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ক্রমান্বয়ে

মানুষ স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে দেশান্তরিত হয়ে চলেছে। এই দেশান্তরিত হওয়ার ঘটনাকেই 'ডায়াস্পোরা' বলা হয়। আর এই স্থানবদলের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় যে সাহিত্যে, তাকে ডায়াস্পোরা সাহিত্য বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে দেশভাগের আখ্যানগুলি হল ডায়াস্পোরা সাহিত্যের বিশেষ নিদর্শন।

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত, "তারাশঙ্করের শিল্পস্বভাব", *তারাশঙ্করের 'রাধা': একটি সমীক্ষা,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, পৃ. ১২

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, "রাইকমল", *তারাশঙ্কর রচনাবলী,* তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৫৮, পৃ. ৩৭৩

১৬. হক, হাসান আজিজুল, *আগুনপাখি,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃ. ২১২

১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *রাইকমল, তারাশঙ্কর রচনাবলী,* তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৫৮, পৃ. ৩৭৩

১৮. হক, হাসান আজিজুল, *আগুনপাখি,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃ. ৫১